জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আজ এই মহান পরিষদে আপনাদের সামনে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। মানবজাতির এই মহান পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রতিনিধিত্ব লাভ করায় আপনাদের মধ্যে যে সন্তোষের ভাব লক্ষ করেছি, আমিও তার অংশীদার। বাঙ্গালী জাতির জন্য এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কারণ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ বিরাট সাফল্যে চিহ্নিত।

একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে মুক্ত ও সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকারের জন্য বাঙ্গালী জাতি বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। তারা চেয়েছে বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতে।

জাতিসংঘ সনদে যে মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের জনগণের আদর্শ এবং এ আদর্শের জন্য তারা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। এমন এক বিশ্ব-ব্যবস্থা গঠনে বাঙ্গালী জাতি উৎসর্গীকৃত, যে ব্যবস্থায় মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে এবং আমি জানি আমাদের এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্যে আমাদের লাখো লাখো শহীদের বিদেহী আত্মার স্মৃতি নিহিত রয়েছে। আমাদের জন্য বিশেষ সৌভাগ্যের কথা, বাংলাদেশ এমন এক সময়ে জাতিসংঘে প্রবেশ করেছে, যখন এই পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেছেন এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি ছিলেন একজন সক্রিয় মুক্তি সংগ্রামী।

শান্তি ও ন্যায়নীতির সংগ্রাম

মাননীয় প্রেসিডেন্ট, গত বছর আলজেরিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন সফল করে তোলার কাজে আপনার মূল্যবান অবদানের কথা স্মরণ করছি। যাঁদের মহান আত্মত্যাগে বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘে স্থান লাভে সক্ষম হয়েছে, এই সুযোগে আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যেসব দেশ ও জাতি সমর্থন জানিয়েছেন আমি তাঁদের প্রতিও জানাই আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা। নবলব্ধ স্বাধীনতা সংহত করার কাজে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এবং জনগণের জন্য অধিকতর কল্যাণকর কাজে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার কাজে যেসব দেশ ও জাতি বাংলাদেশকে সাহায্য করেছেন আমি তাঁদেরও বাংলাদেশের জনসাধারণের আন্তরিক ধন্যবাদ পৌঁছে দিচ্ছি। বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায় ও শান্তির জন্য সার্বজনীন সংগ্রামের প্রতীকস্বরূপ। সুতরাং বাংলাদেশ শুরু থেকে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক।

জাতিসংঘের জন্মের পর তার এক চতুর্থাংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তার আদর্শ বাস্তবায়নে বিরাট বাধার মুখে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। জাতিসংঘের সনদে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা অর্জনের জন্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার লাখো লাখো মুক্তি সেনানীকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। এই সংগ্রাম এখনো চলছে। গায়ের জোরে বে-আইনিভাবে এলাকা দখল, জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে নস্যাৎ করার কাজে শক্তির ব্যবহার ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে চলেছে এই যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ব্যর্থ হয়নি। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও গিনি বিসাউ-এ বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। এ জয় দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ইতিহাস জনগণের পক্ষে ও ন্যায়ের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত।

ভবিষ্যতের পথ

পৃথিবীর বহু স্থানে অন্যায়-অবিচার এখনো চলছে। আমাদের আরব ভাইয়েরা এখনো লড়ছেন তাঁদের ভূমি থেকে জবর দখলকারীদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য। প্যালেস্টাইনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত জাতীয় অধিকার এখনো অর্জিত হয় নাই। উপনিবেশবাদ উচ্ছেদের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হলেও চূড়ান্ত লক্ষ্যে এখনো পৌঁছেনি। এ কথা আফ্রিকার জন্য আরো দৃঢ়ভাবে

সত্য। সেখানে জিম্বোবি ও নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় স্বাধীনতা ও চরম মুক্তির জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামে এখনো ব্যাপৃত। বর্ণবৈষম্য এই পরিষদে চরম অপরাধ বলে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের বিবেককে তা এখনো ধ্বংস করছে। একদিকে অন্যায় অবিচারের ধারাকে উৎখাতের সংগ্রাম, অন্যদিকে বিরাট চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে। আজ বিশ্বের সকল জাতি পথ বেছে নেয়ার কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন। এই পথ বাছাই করার প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। অনাহার, দারিদ্র, বেকারত্ব ও বুভুক্ষার তাড়নায় জর্জরিত, পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার শঙ্কায় শিহরিত বিভীষিকাময় জগতের দিকে আমরা এগুবো না, আমরা তাকাবো এমন এক পৃথিবীর দিকে, যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা ও বিরাট সাফল্য আমাদের জন্য এক শঙ্কামুক্ত উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম। এই ভবিষ্যৎ হবে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বন্টনের দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেওয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

সাম্প্রতিক কালে গোটা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আমাদের আরো ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ বছরের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিশ্বের বর্তমান গুরুতর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আমি এমন একটি দেশের পক্ষ থেকে কথা বলছি, যে দেশটি বর্তমানে অর্থনৈতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে। এ ক্ষতি কতটা গুরুতর— আমি সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপরই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। তারপর থেকে আমরা একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি। সর্বশেষ এবারের নজীরবিহীন বন্যা। সাম্প্রতিক বন্যা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা জাতিসংঘ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে কৃতজ্ঞ। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

বন্ধুদেশসমূহ ও মানবকল্যাণ সংস্থাগুলোর কাছ থেকেও ভালোই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের অগ্রগতি শুধু প্রতিহত করেনি, দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুণ আমাদের মতো একটি দেশের জন্য দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণের জীবনধারণের মান নিছক বেঁচে থাকার পর্যায় থেকেও নীচে নেমে গেছে। মাথাপিছু যাদের বার্ষিক আয় ১০০ ডলারেরও কম তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম খাদ্য প্রয়োজন তার থেকে কম খাদ্য খেয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সম্পূর্ণ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। দরিদ্র অভাবী দেশগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আভাস দেওয়া হয়েছে তা আরো হতাশাজনক।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে খাদ্যের দাম গরিব দেশগুলোর ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অন্যদিকে ধনী ও উন্নত দেশগুলি হচ্ছে খাদ্যের মূল রফতানিকারক। কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অসম্ভব দাম বাড়ার ফলে গরিব দেশগুলোর খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টাও তেমন সফল হতে পারছে না। বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে। তাদের নিজেদের সম্পদ কাজে লাগানোর শক্তিও হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যেই যেসব দেশ ব্যাপক বেকার সমস্যায় ভুগছে তারা তাদের অতি নগণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোও কেটে ছেঁটে কলেবর ছোট করতে বাধ্য হয়েছে। এই

পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ হারে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। বিশ্বের সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে অগ্রসর না হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এমন বিরাট আকার ধারণ করবে, ইতিহাসে যার তুলনা পাওয়া যাবে না। অবশ্য বর্তমানে অসংখ্য মানুষের পুঞ্জীভূত দুঃখ-দুর্দশার পাশাপাশি মুষ্টিমেয় মানুষ যে অভূতপূর্ব বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সুখ-সুবিধা ভোগ করছে তার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে আমাদের মধ্যে মানবিক ঐক্যবোধ-ভ্রাতৃত্ববোধের পুনর্জাগরণ। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বীকৃতিই কেবল বর্তমান সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান ঘটাতে সক্ষম। বর্তমান দুর্যোগ কাটাতে হলে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার। বর্তমানের মতো এত বড়ো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা জাতিসংঘ অতীতে কখনো করেনি। এ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটা ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা। এ ব্যবস্থায় থাকবে নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রতিটি দেশের সার্বভৌম অধিকারের নিশ্চয়তা। এ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বাস্তব কাঠামো, যার ভিত্তি হবে স্থিতিশীল ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বের সকল দেশের সাধারণ স্বার্থের স্বীকৃতি। এখন এমন একটি সময় যখন আমাদের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে যে, আমাদের একটা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব হলো বিশ্বের প্রতিটি মানুষ যাতে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মর্যাদার উপযোগী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষণায় এ অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এমনভাবে পালন করতে হবে যাতে প্রতিটি মানুষ নিজের ও পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের মান প্রতিষ্ঠা অর্জনের নিশ্চয়তা লাভ করে।

আন্তর্জাতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশই যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করতে সক্ষম, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করার পরিবেশই শুধু গড়ে উঠবে না, এ প্রতিযোগিতায় যে বিপুল সম্পদ অপচয় হচ্ছে, তা মানবজাতির সাধারণ কল্যাণে নিয়োগ করা সম্ভব হবে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান

বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে। এই নীতির মূলকথা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের সঙ্গে মৈত্রী। শান্তির প্রতি যে আমাদের পূর্ণ অনুগত্য তা এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছে যে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা আমাদের কষ্টার্জিত জাতীয় স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করতে পারবো এবং ক্ষুধা, দারিদ্র, রোগশোক, শিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবো। সুতরাং আমরা স্বাগত জানাই সেই সকল প্রচেষ্টাকে, যার লক্ষ্য বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিত করা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি জোরদার করা। এই নীতি অনুযায়ী ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা রাখার প্রস্তাবে আমরা অবিরাম সমর্থন জানিয়ে এসেছি। ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা রাখার প্রস্তাব এই পরিষদেও সক্রিয় শক্তিশালী অনুমোদন লাভ করেছে।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকারূপে ঘোষণার অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বিশ্বের যে উদীয়মান জাতিসমূহ একত্রিত হয়েছিলেন, তারা শান্তির পক্ষে শক্তিশালী সমর্থন জুগিয়েছেন। তারা বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভিন্ন প্রতিজ্ঞার কথাই আবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নর-নারীর গভীর আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে রয়েছে। ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি কখনো স্থায়ী হতে পারে না।

উপমহাদেশে বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি

আমরা শান্তিকামী বলে আমাদের এই উপমহাদেশে আমরা আপোশ-মীমাংসা-নীতির অনুসারী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের অভ্যুদয় উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে এবং অতীতের সংঘাত ও বিরোধের বদলে আমাদের তিনটি দেশের জনগণের মধ্যে কল্যাণকর সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। আমরা আমাদের মহান নিকট প্রতিবেশী ভারত, বার্মা ও নেপালের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছি। অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে পাকিস্তানের সাথে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টায়ও লিপ্ত রয়েছি।

অতীতের তিক্ততা দূর করার জন্য আমরা কোনো প্রচেষ্টা থেকেই নিবৃত্ত হই নাই। ১৯৫ জন যুদ্ধ-অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে এই উপমহাদেশে শান্তি ও সহযোগিতার নতুন ইতিহাস রচনার কাজে আমরা আমাদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছি। এই ১৯৫ জন যুদ্ধ-অপরাধীর বিরুদ্ধে মানবতা-বিরোধী অপরাধে লিপ্ত থাকার অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল, তবু সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে আমরা ক্ষমার এমন উদাহরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছি, যা এই উপমহাদেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। উপমহাদেশের শান্তি নিশ্চিত করার কাজে আমরা কোনো পূর্বশর্ত দিই নাই কিংবা দরকষাকষি করি নাই। বরং জনগণের জন্য আমরা এক সুকুমার ভবিষ্যৎ প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়েছি। অন্যান্য বড় বিরোধ নিষ্পত্তির কাজেও আমরা ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সমঝোতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। ৬৩ হাজার পাকিস্তানি পরিবারের দুর্গতি একটি জরুরি মানবিক সমস্যা হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের কথা তারা আবার প্রকাশ করেছেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাদের নাম রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির কাছে তালিকাভুক্ত করেছেন। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও আইন অনুসারে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার তাদের রয়েছে। এই সঙ্গে মানবতার তাগিদে তাদের সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। সাবেক পাকিস্তানের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বাঁটোয়ারা আর একটি সমস্যা, যার আশু সমাধান দরকার। বাংলাদেশ আপোশ-মীমাংসার জন্য প্রস্তুত। আমাদের প্রত্যাশা এই উপমহাদেশের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থে পাকিস্তান আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবে এবং ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। তাহলে উপমহাদেশে পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার পথে আর কোনো বাধা থাকবে না। বাংলাদেশ তার সকল প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং একে অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

বিশ্বের এ এলাকায় এবং অন্যত্রও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

জাতিসংঘ ও মানুষের অগ্রগতি

এই দুঃখ দুর্দশা সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানুষের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল। নানান অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জাতিসংঘ তার জন্মের পর সিকি শতাব্দী কালেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবজাতির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এমন দেশের সংখ্যা খুব কম, যারা বাংলাদেশের মতো এই প্রতিষ্ঠানের বাস্তব সাফল্য ও সম্ভাবনা অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। ড. কুর্ট ওয়াল্ডহাইম এবং তাঁর যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীবৃন্দের প্রেরণাদানকারী নেতৃত্বে এই জাতিসংঘ আমাদের দেশে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের বিরাট

কাজ করেছে। বাংলাদেশের বুক থেকে যুদ্ধের ক্ষত দূর করা, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী কোটি খানেক উদ্‌বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এ কাজের লক্ষ্য। সেক্রেটারি জেনারেল, তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বিরাট দায়িত্ব পালনে সমন্বয় সাধনের প্রেরণা জুগিয়েছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, উপমহাদেশে অবশিষ্ট যে মানবিক সমস্যা রয়েছে, তার সমাধানেও জাতিসংঘ এই রকমের গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সর্বনাশা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী আহরণের কাজে জাতিসংঘ যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে যেসব দেশ বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় এবং বিশ্বসমাজের দ্রুত এগিয়ে আসার উপযোগী নিয়মিত প্রতিষ্ঠান গঠনে বাংলাদেশের বিশেষ স্বার্থ নিহিত রয়েছে। অবশ্য, সূচনা হিসাবে এই ধরনের একটি ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই হয়েছে। এই ব্যবস্থা জাতিসংঘের বিপর্যয় ত্রাণ সমন্বয়কারীর অফিস স্থাপন। সংস্থাটি যাতে কার্যকরভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা একান্ত দরকার। জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশেরই এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

প্রিয় প্রেসিডেন্ট

সর্বশেষে আমি মানবের অসাধ্য সাধন ও দুরূহ বাধা অতিক্রমের অদম্য শক্তির প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থার কথা আবার ঘোষণা করতে চাই। আমাদের মতো দেশসমূহ, যাদের অভ্যুদয় সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে, এই আদর্শে বিশ্বাসই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে হতে পারে। কিন্তু আমাদের ধ্বংস নাই। এই জীবন যুদ্ধের মোকাবেলায় জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই শেষকথা। আত্মনির্ভরশীলতাই আমাদের লক্ষ্য। জনগণের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগই আমাদের নির্ধারিত কর্মধারা। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অংশীদারিত্ব আমাদের কাজকে সহজতর করতে পারে, জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে পারে। কিন্তু আমাদের ন্যায় উদীয়মান দেশসমূহের অবশ্যই নিজেদের কার্যক্ষমতার প্রতি আস্থা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, শুধু জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হতে পারি, গড়ে তুলতে পারি উন্নততর ভবিষ্যৎ।*

* বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৭৪ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর এই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। বাংলাভাষা-পরিকল্পনায় এ এক যুগান্তকারী অধ্যায়। কেননা এর পূর্বে বাংলাভাষা কখনো এ মর্যাদা লাভ করেনি।